নুসুস সিরিজ-০৫

ড. আবদুল্লাহ আল খাতির

মুসলিমদের পরাজিত মানসিকতা

যখন আপনি কোনো মুসলিমের কাছে পুনর্জাগরণের আশা ব্যক্ত করবেন, দেখবেন সে হতাশা ব্যক্ত করছে। সে বলবে, 'তুমি উলো বনে মুক্তা ছড়াচ্ছ।' কেউ হয়তো আরও আগ বাড়িয়ে বলবে, 'তুমি তো ফুটো বেলুনে ফুঁ দিচ্ছ। ফুটো বেলুনে ফুঁ দিয়ে লাভ নেই। এক দিক থেকে ফুঁ দিলে বাতাস অন্যদিক থেকে বের হয়ে যায়।'

আপনি যদি তাদের বলেন, আপনি মুসলিমদের জাগানোর জন্য কেন কাজ করছেন না? সে বলবে, 'কাউকে আমি পাশে পাব না, কেউ আমার কথা শুনবে না।'

মূলত সে হতাশাগ্রস্ত হয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। অনেকের মাঝেই এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ফলে তারা অন্যায়ের নিষেধ ও আল্লাহর পথে আহ্বান করা থেকে পিছিয়ে থাকে। তাদের যুক্তি—মানুষ শোনে না। আসলে তারা নিজেরাই হতাশার মধ্যে আছে। এই হতাশার কারণে তারা দ্বীনপ্রচার, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের মতো অনেক কল্যাণকর কাজ থেকে বঞ্চিত হয়।

মুসলিমদের পরাজিত মানসিকতা বইটি শাইখ ড. আবদুল্লাহ আল খাতির রাহিমাহুল্লাহ-প্রদত্ত একটি ভাষণ। প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে ভাষণটি তিনি বৃটেনে মুসলিম তরুণদের উদ্দেশ্যে প্রদান করেছিলেন। আদর্শ, বিশ্বাস, সমর, শিক্ষা ও সংস্কৃতিসহ ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলিমদের যে বিপর্যয় পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা আরো বহু আগেই সূচিত হয়েছে। সে প্রেক্ষিতেই বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ করে আবদুল্লাহ আল খাতির ভাষণটি প্রদান করেন এবং পরবর্তী সময়ে গ্রন্থাকারে সংকলন করেন। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিবেচনায় এ বইটি বাংলাভাষাভাষী পাঠকদের সামনে তুলে ধরাটা ছিল সময়ের অন্যতম একটি দাবি। আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

সূচিপত্র

প্রতিকার

মানসিক বিপর্যয়ের লক্ষণ

কী করে বুঝবেন, মুসলিম উম্মাহ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত? মুসলিম উম্মাহর মানসিক বিপর্যয়ের কিছু লক্ষণ আছে। সেগুলো তুলে ধরা হলো :

প্রথম লক্ষণ : হতাশায় ভোগা

মুসলিম উম্মাহ আজ উত্তরণের সম্ভাবনা নিয়ে হতাশ। যখন আপনি কোনো মুসলিমের কাছে পুনর্জাগরণের আশা ব্যক্ত করবেন, দেখবেন সে আপনার কাছে হতাশা ব্যক্ত করছে; আর সে আশাহত-হৃদয়ে আপনাকে কিছু গৎবাঁধা উদাহরণ শুনিয়ে দিচ্ছে।

হয়তো সে বলবে, 'তুমি উলো বনে মুক্তা ছড়াচ্ছ, এখানে তোমার কথা শুনতে কেউ আসবে না।' কেউ হয়তো বলবে, তুমি তো ফুটো বেলুনে ফুঁ দিচ্ছ। ফুটো বেলুনে ফুঁ দিয়ে লাভ নেই। এক দিক থেকে ফুঁ দিলে বাতাস অন্যদিক থেকে বের হয়ে যায়। তেমনি তোমার কথা এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে।

কতিপয় মুসলিম এ-জাতীয় উপমা টেনে উদ্যোমী ব্যক্তিকেও নিস্পৃহ করে তোলে; যারা পরিবর্তন চায় এবং অন্যায়ের বিরোধিতা করে এরা তাদেরও নিরুৎসাহিত করে। আপনি তাদের কাছে গেলে মানসিক বিপর্যয়ের বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখতে পাবেন।

এ ধরনের অনেকের সাথে আমার দেখা হয়েছে। তাদের মধ্যে শিক্ষার্থী যেমন আছে, অনেক শাইখও আছেন। আপনি যদি তাদের কাউকে বলেন, আপনি মুসলিমদের দ্বীন শিখানোর জন্য কেন কোনো শিক্ষা-সেমিনারের আয়োজন করছেন না? সে আপনাকে উত্তরে বলবে, কাউকে আমি পাশে পাব না, কেউ আমার কথা শুনবে না। মূলত সে নিজেই হতাশাগ্রস্ত হয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের মানসিকতার সূক্ষ্ম বর্ণনা দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم

"যে ব্যক্তি বলে, সব মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে, সে-ই মূলত মানুষদের ধ্বংস করেছে।"[১]

নৈরাশ্যবাদীদের অবস্থা বর্ণনার জন্য এটি একটি চমৎকার হাদীস। যে বলে মানুষ ভ্রষ্ট হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে—সেই মূলত আরো বেশি নষ্ট ও আরো বেশি ভ্রষ্ট।

অনেকের মাঝেই এই প্রবণতা দেখা যায়। (তারা ভাবে—অমুক নষ্ট হয়ে গেছে, তাকে আর কিছু বলে লাভ নেই)। ফলে তারা অন্যায়ের নিষেধ ও আল্লাহর পথে আহ্বান করা থেকে পিছিয়ে থাকে। তাদের যুক্তি—মানুষ শোনে না। আসলে তারা নিজেরাই হতাশ; এই হতাশার কারণে তারা দ্বীনপ্রচার, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের মতো অনেক কল্যাণকর কাজ থেকে বঞ্চিত হয়।

দ্বিতীয় লক্ষণ : শ্রেষ্ঠ হওয়ার স্বপ্ন হারিয়ে ফেলা

কিছু মানুষ পাবেন, এরা নিজেদেরকে ওই সমস্ত লোকদের সাথে তুলনা করে—যারা শ্রেষ্ঠত্বে তাদের চেয়ে নিচে; আর যারা তাদের চেয়ে ওপরে এরা তাদের লক্ষ করে না। এরা বরং নিম্নতর লোকদের চেয়ে কিছুটা ভালো হওয়ায় এরা আত্মতুষ্টি অনুভব করে আর নিজেদের সাফাই গাইতে থাকে।

তৃতীয় লক্ষণ : নিজের পরিচয় ভুলে যাওয়া

কিছু মুসলিম পাবেন, জ্ঞানের বিস্তৃত পরিসরে এরা সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন নিয়ে ভাবে না। এরা কখনো চিন্তাও করে না যে, তারা সৃজনশীল ও উদ্ভাবক হতে পারে কিংবা তারা হতে পারে বিশ্ব-নেতৃত্বের অধিকারী। এমনকি প্রযুক্তিগত বিষয়াদিতেও এরা অন্যের অনুগামী হয়ে থাকে।

এ ধরনের মানসিকতা আপনি বিভিন্ন দেশেই পাবেন। ফলে দেখবেন, তারা নিজ দেশের প্রয়োজনীয় সাধারণ বিষয়াদিও তৈরি করতে পারছে না, বরং তারা সবকিছু বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করে। এরা সর্বদা অন্যদের অনুগামী হয়ে থাকে। নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্যের গুপ্ত ভান্ডার সম্পর্কে না জানার ফল তাদের এই পরাজিত ও দুর্বল মানসিকতা।

চতুর্থ লক্ষণ : পশ্চিমা রীতিনীতি অনুসরণ করা

অনেকেই আছে যারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন অমুসলিম দেশে অধ্যয়ন করে,

---

[১] ধ্বংস মানে শেষ হয়ে যাওয়া, যেখানে পরিত্রাণের আর কোনো পথ অবশিষ্ট নেই। হতাশা থেকেই মানুষ এ ধরণের কথা বলে এবং এ ধরণের কথা বলে অন্যদেরকেও হতাশ করে।

তারপর দেশে ফেরার সময় তাদের পজিটিভ-নেগেটিভ অনেক কিছুই সাথে করে নিয়ে আসে। এদের মাঝে মানসিক বিপর্যয়ের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। তারা যে পজেটিভ-নেগেটিভ অনেক শিক্ষা-সংস্কৃতি সাথে করে এনেছে, এটাই তাদের বিপর্যস্ত মানসিকতার লক্ষণ। এরা ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্য করতে পারেনি। এরা নির্ণয় করতে পারেনি যে, অমুসলিমদের কাছ থেকে জাগতিক কোন জ্ঞানটি নেয়া যেতে পারে এবং ভালো কোনো গুণ থেকে থাকলে সেগুলো কী—যা আমাদের অর্জন করা প্রয়োজন? সাথে সাথে তাদের কী কী কৃষ্টি, কালচার ও অন্ধ-অনুকরণ আছে—যেগুলো আমাদের বর্জন করা উচিত? তারা দুয়ের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না বলেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের পজিটিভ-নেগেটিভ সব গ্রহণ করে।

বাস্তবতা হলো পশ্চিমারা এগিয়েছে যন্ত্র ও প্রযুক্তিতে, মানবতার দিক থেকে তারা অগ্রসর হতে পারেনি। (পশ্চিমাদের উন্নতির) বিভিন্ন রিপোর্টে যে রেখাটি ওপরের দিকে উঠে গেছে, সেটা কেবল প্রযুক্তির দিক থেকে। কেননা তারা প্রচুর যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। তাই যে জাতি তাদের সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণ করবে এবং তাদের সামগ্রিক জীবনপদ্ধতি অবলম্বন করবে, তারা হবে মানসিকভাবে চরম অধঃপতিত।

সুতরাং তাদের কাছে যে উন্নতি রয়েছে সেটা প্রযুক্তির উন্নতি, মানবতার নয়। মানবতার মাপকাঠিতে আমরা উন্নতি লাভ করতে পারি কেবল আমাদের দ্বীন মেনে চলার মধ্য দিয়ে। তবে তাদের আবিষ্কার ও প্রযুক্তিকে আল্লাহর আনুগত্যের পথে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে আমরা সেগুলোও তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারি।

পঞ্চম লক্ষণ : পরিস্থিতি বদলে দেবার হিম্মত হারিয়ে ফেলা

রাজনীতি ও অন্যান্য দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিমদের যে দুর্বল অবস্থা, এ অবস্থার ওপরও অনেক মানুষ সন্তুষ্ট। আপনি দেখবেন, অনেকে আত্মসমর্পণমূলক বা পরাজয়মূলক সমাধান মেনে নিতে তৎপর—তারা সন্ধিচুক্তির কিয়দংশ বা অর্ধেকাংশ পেয়েই তুষ্ট!

উদাহরণস্বরূপ—এমন অনেক মানুষ আছে যারা বলে, ইসরাঈল রাষ্ট্র একটি বাস্তবতা, সুতরাং ইসরাঈলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার কোনো বিকল্প নেই। বস্তুত তারা পরাজয় বরণ করে নিয়েছে এবং বিজয় অর্জনের গুণাবলিও হারিয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"তোমরা হীনম্মন্য হোয়ো না এবং দুশ্চিন্তা কোরো না, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি

তোমরা মুমিন হও।”[২]

তারা বিজয়ীর গুণাবলি হারিয়ে বসেছে। ফলে তারা ভবিষ্যতের জন্য পুনর্জাগরণ কিংবা নতুন কোনো ক্ষেত্র তৈরির প্রস্তুতি নেয় না, বরং বর্তমানের পরাজয় নিয়ে তারা তুষ্ট। অপরদিকে আলেমগণ সন্তুষ্ট ফাতওয়ার আধিক্য, পঠন-অধ্যয়ন ও ওয়াজ-নসীহত নিয়ে। তারা পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে তারপর উপদেশ দিতে থাকেন; পরিস্থিতি পরিবর্তনের কথা তারা বলেন না। আমরা দেখি, পরিস্থিতির সাফায়ি গাওয়ার জন্য তারা ওযর খোঁজেন, পরিস্থিতি বদলে দেওয়ার জন্য তারা তেমন উপকরণ খোঁজেন না। ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তাবনা ও সমাধান তুলে না ধরে নিছক বর্তমান সমস্যার সমাধান ও ফতোয়া দেওয়ার প্রবণতা—এটাও দুর্বল ও পরাজিত মানসিকতার লক্ষণ!

ষষ্ঠ লক্ষণ : স্পষ্টভাবে ইসলামের কথা না বলা

নিজের ইসলামি ব্যক্তিত্বকে গোপন রাখার প্রবণতা, আত্মমর্যাদাবোধ না থাকা ও মানসিক দুর্বলতা মুসলিম তরুণদের মাঝে প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে। অনেককেই দেখবেন, এ ধরনের কথা বলতে লজ্জা পায়—এটা হালাল, এটা হারাম... বিশেষত যখন সে কোনো অমুসলিমের সাথে কথা বলে। দেখবেন, যখন কোনো অমুসলিম হারাম কিছু পরিবেশন করছে কিংবা হারামের দিকে ডাকছে তখন সে বলে—ধন্যবাদ... আমি চাইছি না, কিংবা অন্য কিছু হোক... এভাবেই সে তার মন রাখার চেষ্টা করে কিন্তু স্পষ্ট করে বলে না যে, এটা মুসলিমদের নিকট হারাম।

কট্টর, মৌলবাদি কিংবা একরোখা বলা হয় কি না—এ আশঙ্কায় অনেককেই দেখবেন (ইসলামের বিধান) স্পষ্ট করে বলতে ভয় পায়।

অমুসলিমদের পোশাক পরিধানের মধ্য দিয়েও এই মানসিক বিপর্যয় আপনি দেখতে পাবেন। যখন তারা পশ্চিমাদের দেশে যায়, তখন তাদের কেউ কেউ তো পুরোদস্তুর পশ্চিমা সাজে এবং পশ্চিমাদের ক্যাপ পর্যন্ত পরে। পশ্চিমাদের পোশাকআশাকের ব্যাপারেও তারা প্রচণ্ড রকমের উৎসুক থাকে।

এরা পশ্চিমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পোশাকআশাকসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ওদের অনুকরণ করে। এদেরকে দেখলে আপনার মনে হবে যেন ফরাসি। তারা যে নিজেদের স্বকীয়তা ও সম্পদের মাঝে মর্যদাবোধ খুঁজে পায় না, এটা মানসিক বিপর্যয়ের লক্ষণ।

সম্ভবত পূর্বেও আমি আপনাদের এক ইংরেজের কথা বলেছি, যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং ইসলামের মাধ্যমেই তিনি মর্যাদাবান হয়েছে। সমস্যা নেই! যারা

[২] সূরা আলে ইমরান : ১৩৯

শোনেননি, তাদের জন্য আবারো বলছি—

সেই ইংরেজ যুবকের সাথে আমার লন্ডনের গিলফোর্ডে সাক্ষাৎ হয়েছিল। সে ইসলাম গ্রহণ করল এবং ইসলাম গ্রহণের কয়েক সপ্তাহ পর অন্য এক দেশে একটি চাকরির ইন্টার্ভিউর জন্য ডাক পেল। ইসলামী সংঘের যুবকরা তখন তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল—তাকে গিয়ে বোঝানো, যেন সে ভাইবা-বোর্ডে তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ না করে। কেননা ভাইবা-বোর্ড হয়তো তার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পেলে তাকে ফিরিয়ে দেবে। তাদের ভয় ছিল—চাকরি না পাওয়ার ফলে ভাইটি মানসিকভাবে আঘাত পেয়ে দ্বীন ছেড়ে দিতে পারে! কিন্তু ইসলামী সংঘের যুবকরা গিয়ে যুবকটির দেখা পেল না, কারণ তার আগেই সে ওই চাকরির ভাইবার জন্য রওনা হয়ে গেছে।

স্বাভাবিকভাবেই সেখানে একটিমাত্র পদের জন্য আরো অনেক অমুসলিম ক্যান্ডিডেট ছিল। একটা সময় ইংরেজ মুসলিম যুবকটির ডাক এল। যুবকটি ভাইবা-বোর্ডের সামনে উপস্থিত হয়ে বলল, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, আমার পূর্বের নাম 'ওয়ার্দ' আর বর্তমান নাম উমার। সে আরো বলল, আমি আমার ধর্ম পরিবর্তন করেছি, আমার নাম পরিবর্তন করেছি; আমি চাই, যদি আপনারা আমাকে এই চাকুরির জন্য নিয়োগ দেন তাহলে আমাকে সালাতের জন্য সময় দেবেন।

অবাক বিষয় হলো এই চাকুরির জন্য ভাইবা-বোর্ডের সবাই এই যুবককেই বাছাই করলেন। তার চেয়ে অবাক বিষয় হলো তারা যুবকটিকে বললেন, আমরা এমন একজন ব্যক্তি খুঁজছিলাম, যার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা (Decision making power) আছে। সেই ক্ষমতা আমরা আপনার মাঝে দেখতে পেয়েছি, কেননা আপনি আপনার নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করার মতো দুঃসাহসী সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছেন।

এই ব্যক্তি আত্মমর্যাদার সাথে তার ইসলামী ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করছে, কারণ সে সামাজিক চাপ ও সমস্ত বাধাকে উপেক্ষা করেই দ্বীন গ্রহণ করেছে। এ ধরনের সামাজিক চাপ আমাদের সমাজেও আছে। কিন্তু আমরা সেসব ফাসেক ও দুর্বলমনা পরাজিতদের হিসাব কষি—যারা নিজেরা দ্বীন মানার ক্ষমতা রাখে না। ফলে দ্বীনের অর্ধেকটা ছেড়ে হলেও আমরা তাদের সাথে সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করি, যেন তারা ভাবে—আমাদের মাঝে কট্টরতা নেই আবার আমরা আমাদের সালাতের বিষয়েও যত্নশীল!

এ ধরনের মানুষ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এমন পন্থা অবলম্বন করতে সচেষ্ট হয়, যে পন্থায় সে ওদের মনরঞ্জন করতে পারে। এ পন্থায় ধীরে ধীরে তাকে দ্বীনের অর্ধেকটাও ছেড়ে দিতে হয়।

মানসিক বিপর্যয় এভাবেই ঘটে... আর এ বিপর্যয়ের ফলে মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে জোরালোভাবে প্রকাশ করতে পারে না।

যারা ইসলামে নতুন করে প্রবেশ করে, তারা দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুই গ্রহণ করে নিতে চায়, কোনো ধরনের চাপ ছাড়াই। কেউ একজন ইসলাম গ্রহণ করার পর বলেছিল, "আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছি, তখন—উদাহরণস্বরূপ এই পোশাক যদি ইসলামি হয়, আমি কেন পরব না?

আপনি দেখবেন, রিভার্টেড মুসলিমরা ইসলাম নিয়ে গর্ববোধ করে। দেখবেন, কেউ পাগড়ি পড়ছে, কেউ সর্বত্রই ইসলামি পোশাক পরিধান করছে, আর এসবকে নিজের মর্যাদার বিষয় মনে করে। এ ধরনের সম্মানবোধ দ্বীনের সাথে তার জোরোলো সম্পর্ককেই নির্দেশ করে। এটা নির্দেশ করে, দ্বীনের সাথে নিজেকে খাপ-খাইয়ে-নিতে সে কতটা আগ্রহী। পক্ষান্তরে যারা মুসলিম ঘরের সন্তান হওয়ার সুবাদে মুসলিম, তাদের দেখবেন, তারা এক্ষেত্রে অনেক দুর্বল।

আমি এখানে সাহাবীগণের একটি ঘটনা উল্লেখ করছি, যা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেবে এবং আমাদের সকলের জন্য আত্মমর্যাদার বিষয়টি স্পষ্ট করে দেবে—যে আত্মমর্যাদাবোধ সকলেরই থাকা উচিত। এ ক্ষেত্রে এটি একটি উৎকৃষ্ট ঘটনা। পারস্যের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধের সময় সাহাবী রিবিঈ বিন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে এই ঘটনাটি ঘটে। পারস্য সেনাপতি ছিল রুস্তম আর মুসলিমদের সেনাপতি ছিলেন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু।

রুস্তম আলোচনার জন্য মুসলিমদের একটি প্রতিনিধিদল চাইল। মুসলিমরা কেন এসেছে, ইত্যাদি বিষয় জানতে চায় রুস্তম। সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একদল প্রতিনিধি পাঠালেন, সে দলে রিবিঈ বিন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। যখন তিনি রুস্তমের কাছে গেলেন, রুস্তম বলল, তোমরা কেন এসেছ? রিবিঈ বিন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন, যেন আমরা আল্লাহর বান্দাদেরকে মানুষের দাসত্ব থেকে এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে বের করে আনি, যেন পৃথিবীর সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দিয়ে প্রশস্ত পৃথিবীর বুকে নিয়ে আসি।

রুস্তম বলল, আমি কত নিঃস্ব! আমার সেনাবাহিনীর মাঝে গায়িকা ও পাচকের সংখ্যাই সহস্র, তবুও এ যুবকের মতো কেউ নেই।

দেখুন, রুস্তম তার এ রাজকীয় অবস্থার মাঝে থেকেও রিবিঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সামনে নিজেকে নিঃস্ব অনুভব করছে। অথচ রিবিঈ বিন আমের জাযিরাতুল আরব তথা একটি দ্বীপের সাধারণ মানুষ—যাকে পারসিকরা গ্রাম্য হিসাবে বিবেচনা করে

থাকে। রুস্তমদের যে বস্তুগত সভ্যতা আছে—সে তুলনায় তাদের কিছুই নেই। এসত্ত্বেও রিবিঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, পৃথিবীর সংকীর্ণতা থেকে বিশালতার দিকে মানুষকে নিয়ে যেতে এসেছি...

রিবিঈ বিন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু রুস্তমকে বলে চললেন, ...এবং আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন, যেন আমরা ধর্মগুলোর অনাচার প্রতিহত করে তাদের মাঝে ইসলামের ইনসাফ ছড়িয়ে দিই। আল্লাহ আমদেরকে তার দ্বীন দিয়ে তাঁর সৃষ্টিজীবের কাছে পাঠিয়েছেন, যেন আমরা তাদের আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান করি। যে আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করবে, আমরাও তাকে গ্রহণ করে নিব এবং তার সাথে যুদ্ধ না করে ফিরে যাব; আর যে অস্বীকার করবে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি লাভ করা পর্যন্ত আমরা তার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাব।

রুস্তম জিজ্ঞেস করল, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কী?

রিবিঈ : যারা লড়াই করতে করতে শহীদ হবেন, তাদের জন্য জান্নাত আর যারা বেঁচে থাকবে, তাদের জন্য বিজয়।

'তোমাদের কথা শুনলাম'—এ কথা বলে রুস্তম আলোচনা শুরু করল—তোমরা কি যুদ্ধ বিলম্ব করবে, যেন আমরা বিষয়টি ভাবতে পারি এবং তোমরাও ভাবার সুযোগ পাও।

রিবিঈ : হ্যাঁ, আপনারা ক'দিন চান? একদিন না দুদিন?

রুস্তম : না, আমাদের জ্ঞানী-গুণী ও নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলতে যে ক'দিন লাগে।

রিবিঈ : সংঘর্ষের সময় শত্রুবাহিনীকে তিন দিনের বেশি অবকাশ দেওয়ার রীতি আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রেখে যাননি। (রিবিঈ আত্মমর্যাদা নিয়ে বলছেন,) তিন দিনের সময় দেওয়া হলো, আপনারা আপনাদের সিদ্ধান্ত ভেবে-চিন্তে গ্রহণ করুন।

রুস্তম : তুমি কি মুসলিমদের নেতা?

রিবিঈ : না, তবে মুসলিমরা এক দেহের মতো, সবেচেয়ে সাধারণ মুসলিম যে চুক্তি করে সেটা সর্বোচ্চ পর্যায়ের মুসলিমের জন্যও প্রযোজ্য।

রুস্তমের কথা শিথিল হতে থাকল; সে তার লোকদের সাথে পরামর্শ করল, যেন সে পরাজয় মেনে নিতে চাইছে।

তার লোকেরা তাকে বলল, আপনি আপনার দ্বীন ছেড়ে এই কুকুরের কথা মেনে

নিবেন? তার পোশাক দেখুন।

রুস্তম বলল, ধুর! তোমরা পোশাকআশাক দেখো না; তার কথা, চিন্তা ও তাকে দেখো। আরবরা তো পোশাকআশাক ও খাবার-দাবারে গুরুত্ব দেয় না, গুরত্ব দেয় তাদের বংশ পরিচয়ে।

একজন মুসসলিমের কথা শুনে এই হলো রুস্তমের দৃষ্টিভঙ্গি। এখনকার আরবরা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আরব যুবকদের এখন গুরুত্বের বিষয় পোশাকাদি। বংশ, অমুসলিম নারীদের সাথে সম্পর্ক এবং এ-জাতীয় বিষয়াদি তাদের কাছে স্বাভাবিক। তারা নতুন কোনো মডেল, ফ্যাশন ও সাজসজ্জা দেখলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এরপর তারা আরেক ডিজাইনের পিছু ছুটে, নববর্ষের পোশাক, শীতকালীন পোশাক, বস্ত উৎসবের পোশাক, পোশাক... আর পোশাক... প্রচুর পোশাক! দেখবেন, তারা হুজুগে বিভিন্ন ধরনের পোশাকের ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

এ উদাহরণে আমদের আলোচ্য বিষয় হলো দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে রিবিঈ বিন আমেরের 'আত্মমর্যাদাবোধ'। ঐতিহাসিকরা রিবিঈ বিন আমেরের ঘটনা উল্লেখ করে লিখেছেন—

রিবিঈ বিন আমের রুস্তমের সভাকক্ষে আসার আগেই সে তা নানা রকম মণি-মুক্তা-জাওহার ও নানান রকম সাজ-সজ্জা দিয়ে পূর্ণ করে রেখেছিল। সে এসব চাকচিক্য দেখিয়ে বেদুইন আরবদেরকে ভড়কে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু রিবিঈ বিন আমের যখন আসলেন, অস্ত্র নিয়েই সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন। প্রহরীরা তাকে বলেছিল, অস্ত্র রাখো। তিনি বললেন, তোমরাই আমাকে ডেকেছ, আমি আসিনি। এভাবেই যেতে দিলে প্রবেশ করব, নয়তো ফিরে যাবে। সৈনিকরা বাধ্য হয়ে তাকে সেভাবেই প্রবেশের অনুমতি দিলেন। ফলে তিনি তার অস্ত্র ও বর্ষা নিয়েই প্রবেশ করেছিলেন। তারা তাকে অবাক করে দেওয়ার জন্য কারুকাজ-খঁচিত যে গালিচা বিছিয়েছিল, সে গালিচা তিনি বর্ষার আঘাতে ছিঁড়তে ছিঁড়তে সামনে অগ্রসর হলেন। রুস্তমের সামনে গিয়ে তিনি তার ঘোড়া তার সিংহাসনের একটি খুঁটির সাথে বাঁধলেন।

কী আত্মমর্যাবোধ! আমি আসিনি, তোমরা ডেকেছ! আমাকে এভাবেই যেতে দেবে নয়তো ফিরে যাব। আর এখন মুসলিমরা কাফেরদের কাছে যায়। তারা যায় হীনবল ও পরাজিত মানসিকতা নিয়ে।

সপ্তম লক্ষণ : লক্ষ্য ছোটো হওয়া

উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও দূর পথের লক্ষ্য ছেড়ে দিয়ে সীমিত কোনো অর্জন পেয়ে তুষ্ট থাকা

বিপর্যস্ত মানসিকতার লক্ষণ। অধিকাংশ আলেমকে দেখবেন, তাদের লক্ষ্য খুব সীমিত। আপনি কোনো আলেমের সাথে কথা বলে দেখুন, সে এ ধরনের সুউচ্চ লক্ষ্য লালন করে না যে, আমি দ্বীনের দাওয়াত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিব; কোনো দিনও তার চিন্তায় আসে না যে, একদিন বিশ্বে ইসলামের আধিপত্য চলবে এবং ইসলামই বিশ্বের নেতৃত্ব দিবে। দেখবেন, এরা তাদের সুউচ্চ লক্ষ্য ও বুলন্দ হিম্মত ভুলে সরল লক্ষ্য নিয়ে আত্মতুষ্ট! দাঈদের অবস্থাও একই রকম। তারা সীমিত-পরিসরে ইসলাম মানাকেই যথেষ্ট মনে করে, ইসলামকে জীবনের সর্বপরিসরে বিস্তৃত করার ও মানার সুউচ্চ লক্ষ্য তারা ধারণ করে না। আমরা দেখতে পাই, এ ধরনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাখা দৃঢ়প্রত্যয়ী ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা এ বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করে বলেছেন,

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"রহমানের যে-সমস্ত বান্দারা বলে, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের আমাদের স্ত্রী ও বংশের মধ্য থেকে চক্ষু শীতলকারী সন্তান দান করুন এবং আমাদের মুত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে দিন।"[৩]

অর্থাৎ আপনি আমদেরকে মুত্তাকীদের আদর্শ বানিয়ে দেন; নিছক পথভ্রষ্ট বা নিছক সৎ মুমিনদের নয়, বরং যারা মুত্তাকী হবে তাদের আদর্শ! এটাই হলো সুউচ্চ মনবল, যে মনবল ধারণ করে আমাদের আত্মগঠন করতে হবে।

উচ্চ লক্ষ্য বিসর্জনের আরেকটা নমুনা এই যে, আপনি দেখবেন অনেক ছাত্র ও তরুণ তাদের চিন্তাকে সীমাবদ্ধ করে সমসাময়িক কাউকে নিজের আদর্শ বানিয়ে থাকে। অর্থাৎ তার জীবনে যার কোনো ভূমিকা রয়েছে কিংবা যিনি তার উস্তাদ এমন কাউকে তার আদর্শ বানিয়ে নেয়। অথচ সে তার আদর্শ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বানায়নি।[৪] বরং এ শিক্ষার্থী ভাবতেই পারে না যে, কোনো দিন সে তার শিক্ষককেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। বরং সে মনে করে, এ ধরনের চিন্তা মাথায় আসা মানে তার উস্তাদের প্রতি অবমাননা। কখনো এ ধরনের শিক্ষার্থী মনে করে, তার

---

[৩] সূরা আল-ফুরকান : ৭৪

[৪] এই বিষয়টি সামান্য পর্যালোচনার দাবি রাখে। কেননা, অনেক সময় চোখের সামনে থাকা উস্তাদ বা শাইখকে আদর্শ বানানো হয়ই এই উদ্দেশ্যে, যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শকে পুরোপুরি নিজের ভেতর ধারণ করা যায়। কারণ চোখের সামনে থাকা ব্যক্তির কথা-কাজ যতটা অন্তরে প্রভাব ফেলে, অনেক সময় কিতাবের বর্ণনা দ্বারা তা সাধিত হয় না। উস্তাদ যখন নিজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহের অনুসারী হন তখন তাকে আদর্শ বানানো মানে প্রকারান্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কেই আদর্শ বানানো। কেননা উস্তাদকে আদর্শ মানা হচ্ছে নিজের ভেতর দ্বীন-সুন্নাহের বাস্তবায়নের জন্যই। সুতরাং মূল উদ্দেশ্য হলো, নবীজির আদর্শের অনুসরণ। এর সহায়ক হিসেবে উস্তাদকে আদর্শ বানানো হচ্ছে। হ্যাঁ, যদি কেউ উস্তাদ বা শাইখের অনুসরণ করাকেই মূল বানিয়ে নেয়, চাই তিনি ভুল কিছু করুন বা শুদ্ধ, তখন সেটা অবশ্যই আপত্তিযোগ্য ও প্রত্যাখ্যাত চিন্তার অন্তর্গত হবে। (সম্পাদক)

শিক্ষকের যে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা রয়েছে, সেখানে তার পৌঁছা সম্ভব নয়।

যদি সে মনে করে যে, তার উস্তাদ কোনো বিষয়ে ভুল করেছে, তবুও সে কোনো দিন চিন্তাও করে না যে, এ বিষয়ে তার উস্তাদের সাথে কথা বলা উচিত। সে মনে করে, এ বিষয়ে কথা বলা মানে তার উস্তাদকে ছোট করা। তাই সে নিজের মনকে এ কথা বলে সান্ত্বনা দেয়, হয়তো তার উস্তাদই সঠিক। এটা একটি ভুল চিন্তা। কেননা যদি আমরা ধরে নেই যে, ছাত্র তার উস্তাদ কিংবা শাইখের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না তাহলে তো মুসলিমদের অধঃপতন শুরু হয়ে যাবে। কেননা এতে করে শিক্ষকের ইলমের একটি স্তর থাকবে, তার ছাত্রের স্তর থাকবে আরেকটু নিচে, ছাত্রের ছাত্রের স্তর থাকবে আরো নিচে, আরো নিচে... আরো নিচে... এভাবে মানুষ জ্ঞানের তলানিতে গিয়ে পৌঁছবে।

এ ধরনের চিন্তা বাস্তবতা বিবর্জিত। এ ধরনের চিন্তার মাঝে কেউ যদি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে তবে সে উন্নতি করতে পারবে না। এ ধরনের চিন্তা লালনের দ্বারা মানুষ দুর্বলমনা হয়ে যায়। ছাত্র যদি তার উস্তাদকে ছাড়িয়ে যায়, এতে উস্তাদের অপমানের কিছু নেই, এতে তার মর্যাদাও কমে না।

আমি আপনাদের প্রশ্ন করছি, আপনারা কি ইবনু তাইমিয়ার উস্তাদদের নাম বলতে পারবেন? ইমাম বুখারীর উস্তাদ কারা ছিলেন? ইমাম মুসলিমের শাইখ ছিলেন কারা?

এঁরা সকলেই তো এমন আলেম, নিজেদের কর্মের জন্য যাদের মজবুত একটি নাম-পরিচয় আছে। তারপরও তাদের উস্তাদদের নাম সাধারণ মানুষ জানে না বললেই চলে।

যদি পূর্বেও আমরা এ ধরনের পরাজিত চিন্তা-চেতনা ধারণ করতাম তাহলে বলতাম, ইমাম ইবনু তাইমিয়া তাঁর উস্তাদ থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারবে না, তাহলে আর গণ্ডির বাইরে ইবনু তাইমিয়া আসতেন না। ইমাম বুখারীর বেলায়ও একই কথা।

সুতরাং এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা ভুল। আমাদের এ থেকে মুক্ত হতে হবে।

অষ্টম লক্ষণ : শুধুই আত্মরক্ষামূলক জবাব দেওয়া

মুসলিম লেখক ও তরুণদের মধ্যে যারা পশ্চিমা স্কলারদের সাথে আলোচনা ও বিতর্ক করেন, তাদের লিখনিতে হীনম্মন্যতার লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। কিছু মুসলিম লেখক দেখবেন, তারা শুধু ইসলামের ওপর আরোপিত বিভিন্ন অপবাদের জবাবে বই রচনা করেন। তাদের সব লেখাই হয় আত্মরক্ষামূলক। তাদের দেখলে মনে হয়, ইসলাম যেন অপবাদের শেকলে বন্দি। যেমন,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন নয়টা বিয়ে করেছেন?

❖ মুসলিম পুরুষ কেন চারটা বিয়ে করতে পারবে?

❖ চোরের হাত কেটে ফেলতে হবে কেন, কিভাবে, কী ফায়দা ইত্যাদি।

❖ নিজেদের জোড়ালো ও সম্মানজনক অবস্থানের কথা ভুলে (এক ধরনের হীনম্মন্যতা থেকে) এরা এ-সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করে। যারা জানতে চায় তাদের সামনে তো এগুলো স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু তা যেন এমনভাবে না হয় যা দুর্বল মানসিকতার পরিচয় বহন করে।

তেমনি কিছু কিছু তরুণ আছে, বিশেষত যারা পাশ্চাত্যে যায় তারা এ ধরনের বিষয়বস্তুর বই খোঁজে—

এই বিধানের হিকমাহ কী? ওই বিধানের হিকমাহ কী? সে ভাবে : এ-জাতীয় অধ্যয়ন করে অচিরেই পশ্চিমাদের সমস্ত বিদ্বেষ দূর করে দেবে।

বাস্তবতা হলো পশ্চিমারা কথা নয়, কাজ চায়। আপনি তাদের সাথে বিতর্ক করে যতই জবাব দিন, তাদের সন্তুষ্ট করতে পারবেন না। তাদের সন্তুষ্ট করতে পারে কেবল কাজ তথা কথার বাস্তব প্রমাণ। তারা দেখে, এই মানুষ যা বলে তা বাস্তবায়নও করে! এবং সে এটা বাস্তবায়পনের পথে সে সমস্ত কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করতেও প্রস্তুত।

সাইয়িদ কুতুব শহীদ তার আমেরিকায় অবস্থানকালীন সময়ের স্মৃতিচারণ করে বলেন, আমার অনেক মুসলিম বন্ধুরা সেখানে হীনম্মন্যতায় থাকত এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিত; কিন্তু আমি কখনো হীনম্মন্যতা অবনুভব করতাম না। তারা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে আপত্তি করে আমাকে প্রশ্ন করত, আমি তাদের সেসব প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উল্টো তাদের বিভিন্ন রীতি-নীতি ও বিশ্বাস নিয়ে কথা তুলতাম। কেননা ধরুন, এক ব্যক্তি আপনার ওপর অস্ত্র তুলল, তখন আপনি কি তার সাথে আলোচনায় বসবেন নাকি তাকে নিরস্ত্র করবেন? আগে তাকে নিরস্ত্র করুন, তারপর তার সাথে আলোচনায় বসুন এবং আপনার যুক্তি তুলে ধরুন। সাইয়িদ কুতুব যখন তাদের তাদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন তুলতেন তখন তারা হীনবল হয়ে পড়ত, কেননা তারা যে যুক্তির ওপর ভর করে আছে তা তো বড় নড়বড়ে।

নবম লক্ষণ : দ্বীন প্রচারে অলসতা

পৃথিবীর বুকে দ্বীনের প্রচার-প্রসারের ব্যাপারে আলস্য ও শিথিলতা মানসিক বিপর্যয়ের লক্ষণ। এ বিপর্যয় ফুটে ওঠে পরাজিতদের দুর্বলতার মধ্য দিয়ে এবং তাদের কিছু কিছু দলিলের ব্যাখ্যা করার মধ্য দিয়েও—যে দলিলগুলো এ কথা প্রমাণ করে যে, আগামীতে মুসলিমদের অবস্থা আরো নাজুক হবে, আরো দুর্বল হবে এবং ফিতনা-

ফাসাদে দুনিয়া ভরে যাবে।

আমি আপনাদের এ বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। ১। বুখারীর হাদীস : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن.

"অচিরেই এমন হবে—মুসলিমের সর্বোত্তম সম্পদ হবে মেষপাল, যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়া ও কোনো উপত্যকায় আশ্রয় নিবে এবং ফিতনা হতে বাঁচতে সে তার দ্বীন নিয়ে পলিয়ে বেড়াবে।"[৫]

এ-সমস্ত দলিলের দিকে ঝুঁকে সে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আর ব্যাখ্যা করে যে, এটাই সেই জামানা—যখন ফিতনা বেড়ে যাবে। সুতরাং মানুষ থেকে দূরত্ব বজায় রাখাই আমাদের জন্য উত্তম।

এ শ্রেণীর মানুষ কখনো অন্য আরেকটি দলিল নিয়ে আসে। দলিলটি হলো বুখারীর বর্ণনায় আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شرمنه حتى تلقوا ربكم.

"যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের রবের সাক্ষাৎ লাভ করো, পূর্বের সময় থেকে পরের সময় আরো অনিষ্টের হবে।"[৬]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় শাইখ আলবানী বলেন, এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের কথা। অন্যান্য হাদীসের আলোকে যখন আমরা হাদীসটি বুঝব, তখন স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, (ইয়াজিদের মতো) জালেম শাসকের সময় শেষে আবারো খেলাফায়ে রাশেদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দশম লক্ষণ : মানব-রচিত বিধানে সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া

অনেক মুসলিম আছে যারা আল্লাহর শরীয়ার পরিবর্তে মানবরচিত বিধান ও শাসন-ব্যবস্থা নিয়ে তুষ্ট, বরং অধিকাংশ দেশেই আজ মুসলিমরা মানব-রচিত সংবিধান বাস্তবায়ন করেছে। আল্লাহর শরীয়া নিয়ে অন্য আইন ও বিচার-ব্যবস্থা আনয়ন এ কথাই প্রমাণ করে যে, তারা তাদের দ্বীন নিয়ে সন্তুষ্ট নয় এবং তারা বিপর্যস্ত।

---

[৫] বুখারী : ২/৯৬১

[৬] বুখারী : ২/১০৪৭

বিপর্যয়ের কারণসমূহ

উম্মাহর মাঝে বিরাজমান এই ব্যাধির কারণগুলো কী? কিছু কারণ আছে অভ্যন্তরীণ, যেগুলো আমাদের নিজেদের সৃষ্টি; আর কিছু কারণ আছে এমন—যেগুলো বাইরে থেকে এসে আমাদের পরিবেশে মিশে গেছে।

অভ্যন্তরীণ কারণসমূহ

প্রথম কারণ : ঈমানি দুর্বলতা

মুসলিমদের ঈমানের দুর্বলতা। ঈমান যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন সাহস হ্রাস পায়, হতাশা সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি তখন আর কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদ-আপদে সহিষ্ণু থাকতে পারে না। দেখা যায়, ব্যক্তি তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়েরও পিছু নেয়—যা তাদের ব্যক্তিত্বকে নিস্তেজ ও বিপর্যস্ত করে দেয়।

দ্বিতীয় কারণ : জিহাদ ছেড়ে দেওয়া

মুসলিমরা পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক অর্থেই জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করেই বুঝিয়েছেন জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার পরিণতি লাঞ্ছনা ও হীনম্মন্যতা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم إذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم.

"যখন তোমরা 'ঈনা' পদ্ধতিতে কেনা-বেচা করবে, গরুর লেজ ধরে থাকবে, কৃষিকাজে সন্তুষ্ট হয়ে পড়বে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ তোমাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। এ অপদস্থতা কেউ তোমাদের থেকে অপসারণ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে আসবে।"[৭]

ঈনা হলো এক ধরনের কেনা-বেচার পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে হীলার[৮] পন্থা অবলম্বন

---

[৭] আবু দাউদ : ৪৯০

[৮] হীলা অর্থ কৌশল। সুদকে এমন কৌশলে গ্রহণ করা হয় যে, বাহ্যত মনে হয় এটা তো ব্যবসা।

করে সুদ আদান-প্রদান করা হয়। পরে এর ব্যাখ্যা করব ইন-শা-আল্লাহ। এখন তো আর সুদ খেতে হীলা লাগে না; মুসলিমরা প্রকাশ্যেই সুদ নিচ্ছে, প্রকাশ্যেই সুদ দিচ্ছে।

গাভির লেজ ধরে চলা বলতে চাষাবাদ বোঝানো হয়েছে—ভূমি কর্ষণের জন্য কৃষক যখন গরুর লেজ ধরে হাঁকিয়ে চলে...

কৃষিকাজে সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া বলতে বোঝানো হয়েছে দুনিয়ার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া এবং স্থবির হয়ে পড়া।

তোমরা জিহাদ ছেড়ে দেবে...তখন আল্লাহ তোমাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন, তিনি এ লাঞ্ছনা তোমাদের থেকে সরাবেন না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে আসো। এখানে সমস্যার সাথে প্রতিকারো বিদ্যমান, আর তা হলো আল্লাহর কাছে ফিরে আসা, তবেই আল্লাহ সেই লাঞ্ছনা দূরীভূত করবেন, যার মধ্য দিয়ে মুসলিমরা আজ বেঁচে আছে।

তৃতীয় কারণ : বিপদের ভয়ে আতঙ্কিত থাকা

সম্পূর্ণ দ্বীন মেনে চলার পথে সম্ভাব্য বিপদ-আপদের আশঙ্কা ও ভীতি বিরাজ করা। বিষয়টা যেন এমন—তারা ভাবছে, এ পথ গোলাপ ফুলে সুশোভিত! বরং এ পথ তো বিপদসংকুল ও কণ্টকাকীর্ণ। আল্লাহ বলেন,

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ۝

"মানুষ কি মনে করেছে যে, তারা ঈমান এনেছে বললেই, তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে না? তাদের পূর্বে যারা ছিল, তাদেরও পরীক্ষা করেছি। অবশ্যই আল্লাহ জেনে নিবেন, কে সত্য বলেছে আর কে মিথ্যা বলেছে।"[১]

কেউ যদি মনে করে দ্বীনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ, গোলাপ ফুলে সুশোভিত এবং সহজ, সে ভুল করবে। দ্বীনের অনুসারী ব্যক্তিদের জন্য বিপদ-আপদ ও সমস্যার অপেক্ষা করা ছাড়া ভিন্ন উপায় নেই। এ-সমস্ত পরীক্ষার মুখোমুখি তাদের হতেই হবে। আল্লাহ বলেন,

فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

"আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন—কারা সত্য বলেছে; আর তিনি জেনে নিবেন—

---

[১] সূরা আনকাবূত : ২-৩

কারা মিথ্যাবাদী।"[১০]

সত্য নিছক দাবির নাম নয় যে, আপনি বলবেন—আমার নিয়্যত ভালো এবং আমার অন্তর ঠিক আছে। সত্য বরং পার্থিব জীবনের একটি বাস্তবতা—জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে এবং বিপদ-আপদের মুখোমুখি হওয়ার মধ্য দিয়ে যার প্রমাণ দিতে হয়।

দ্বীনের পথে আমাদের কখনো ছোট ছোট পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন দ্বীন মানা শুরু করলে অনেককে তাদের পরিবারের মুখোমুখি হতে হয়; অনেকের সামনে তাদের পরিবার বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তি তার আত্মীয়-স্বজন ও সঙ্গী-সাথিদের দ্বারাও বিপদের সম্মুখীন হতে পারে।

বিপদ কখনো আরো বড় হয়েও দেখা দেয়। যেমন কাউকে কাউকে জেল-জরিমানা, হত্যা-হুমকির মুখোমুখি হতে হয়। দ্বীন অনুশীলনের পথে পরিবারের বাঁধা থেকেও এগুলো বড় ফিতনা। সুতরাং দ্বীনের পথ কণ্টকাকীর্ণ, সহজ নয়। বুখারীর হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

حفت النار بالشهوات وحجت الجنة بالمكاره

"জাহান্নামকে চাহিদাপূর্ণ বস্তু ও প্রবৃত্তি দ্বারা বেষ্টন করে রাখা হয়েছে আর জান্নাতকে বেষ্টন করা হয়েছে কষ্ট-ক্লেশ দ্বারা।"[১১]

চতুর্থ কারণ : নিজেদেরকে ব্যর্থ মনে করা

কিছু মানুষ ভুল করে এবং সেই ভুলকে সাধারণ বিষয় মনে করে; ব্যর্থ হয় এবং সে ব্যর্থতাকে স্বাভাবিক বানিয়ে ফেলে। ফলে তাকে সর্বদা দুর্বলতার মাঝেই থাকতে হয়। এ ধরনের ব্যক্তিকে দেখবেন, কোনো একটি বিষয়ে ব্যর্থ হয়ে সে এই ব্যর্থতাকে তার সারা জীবনের ওপর চাপিয়ে দেয় এবং বলে, আমি তো ব্যর্থ... ফলে সে হতাশা ও মানসিক দুর্বলতায় পর্যবসিত হয়।

পঞ্চম কারণ : ইতিহাসের সাহসী ভূমিকাগুলো ভুলে যাওয়া

সংকীর্ণ দৃষ্টি দিয়ে ইতিহাস পাঠ করা; অথবা ইতিহাসের কোনো একটি সময়কে বা কোনো এক যুগের নির্দিষ্ট কোনো ঘটনাকে সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা।

উদাহরণস্বরূপ—এক ব্যক্তি নির্দিষ্ট একটি শহরে বাস করে। সেখানে সে মুসলিমদের মাঝে পারস্পরিক কলহ ও দ্বন্দ্ব দেখতে পায়। হতে পারে তার দেশে মুসলিমদের অবস্থা

---

[১০] সূরা আনকাবূত : ০৩

[১১] বুখারী : ২/৯৬০

খুব দুর্বল। কিন্তু সে এই এক স্থানের সমস্যাকে সব জায়গার সমস্যা মনে করে হতাশায় ভুগতে থাকে যে, সারা পৃথিবীর মুসলিমদের অবস্থা এমনই।

কয়েকদিন পূর্বে এক ব্যক্তির সাথে আমার আলোচনা হচ্ছিল। তিনি বলছিলেন, 'আমাদের দেশে শিশু-কিশোরদের মাঝে কোরআন হিফজ করার চর্চা এখনো গড়ে ওঠেনি। বড়রাও মৃত্যু পথযাত্রী। এ অবস্থা চলতে থাকলে তো হাফেজে কুরআনের সংকট প্রকট আকারে দেখা দেবে।' এ লোক নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলে তার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখার কারণে হতাশ হয়ে পড়েছেন। অথচ তিনি যদি বহির্বিশ্ব সফর করতেন, কিংবা তার আশেপাশে নজর দিতেন তাহলে অবশ্যই তার এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটত। তিনি দেখতে পেতেন যে, সাধারণ মুসলিমদের মাঝে ইসলামের চর্চা কত বেশি! তাদের মাঝে দ্বীনি চেতনা কত প্রখর! হয়তো সামাজিক কোনো সমীবদ্ধতা কিংবা অন্য কোনো কারণে তার এলাকায় সে চেতনা অনুভূত হচ্ছে না।

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিয়ে দেশ-বিদেশে সফর করলে এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে পড়ালেখা করলে মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত অবস্থা জানা যাবে, যা মনে আশাবাদ সৃষ্টি করবে এবং ইসলামী পুনর্জাগরণের চেতনায় উজ্জীবিত করবে। সুতরাং নির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ডে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখলে নিরাশ হতে হবে।

অনুরূপভাবে একই কথা—যদি নিজেকে আপনি বিশেষ কোনো সময়ের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখেন তাহলেও অন্তর হতাশায় ছেয়ে যাবে। যেমন বর্তমান সময়ের প্রতি লক্ষ করে যদি বলা হয়, ইসলামী বিশ্বের মানচিত্রজুড়ে, গোটা মুসলিম জাতি ভূখণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের পারস্পরিক অবস্থান খুবই দুর্বল, দ্বীনের দাঈগণও প্রত্যেকে বিচ্ছিন্নভাবে মেহনত করেছেন, তাহলে এ-জাতীয় চিন্তা-ভাবনা আমাদের মানসিকভাবে দুর্বল করে দেবে।

যদি আমরা ইতিহাসে ফিরে যায়, তবে সেখান থেকে অনেক শিক্ষা নিতে পারব। উদাহরণস্বরূপ : তাতারদের সময়কাল। তারা মুসলিমদের পরাজিত করে হাজার হাজার মুসলিমকে হত্যা করেছে... বাগদাদে তারা টানা চল্লিশদিন মুসলিমদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। অবশিষ্ট মুসলিমরা তখন আত্মগোপনে চলে গেছিল। বাগদাদে চল্লিশ দিন তাতারীদের হত্যাযজ্ঞের ভয়ে জামাতে সালাত আদায় হয়নি।

তিন শ সতেরো হিজরি। পূর্ব জাজিরাতুল আরবে তখন কারামাতিদের রাজত্ব। সে বছর হজ্জ চলাকালীন জিল-হিজ্জার আট তারিখ তারা আবু তাহের কারামাতির নেতৃত্বে মক্কায় গমন করেছিল এবং মুসলিমদের যাচ্ছেতাইভাবে হত্যা করে হাজরে আসওয়াদ ছিনিয়ে নিয়েছিল। ওদের সরদার সেদিন (আস্ফালন করে) বলেছিল, 'আবাবিল পাখি

কোথায়? কালোপাথুরে মাটির ঢিলা কোথায়?'

তারা হাজরে আসওয়াদ নিয়ে গিয়ে পূর্ব জাযিরাতুল আরবে প্রতিস্থাপন করেছিল। তিনশ উনচল্লিশ হিজরি পর্যন্ত বাইশ বছর হাজরে আসওয়াদ মক্কার বাইরে পূর্ব জাযিরাতুল আরবে ছিল, কারামাতিরা এর চারপাশে তাওয়াফ করত... তারা কাবাকেও স্থানান্তর করতে চাইছিল... কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি!

এরপরও মুসলিমরা আবার তাদের শক্তি মর্যাদা ফিরে পেয়েছে। ক্রুসেডাররা একানব্বই বছর বাইতুল মাকদিসে তালা ঝুলিয়ে আল-কুদস শাসন করেছে। ওখানে না-কোনো জামাত হতো আর না-কোনো জুমুআ। ৪৯২ হিজরি থেকে ৫৮৩ হিজরি পর্যন্ত বাইতুল মাকদিসে ক্রুস ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।

আর এখন! ইহুদিদের আল-কুদসের দখল নেওয়া পঞ্চাশ বছরও হয়নি। তা ছাড়া মুসলিমরা সেখানে জামাতে সালাত আদায় ও জুমুআ পড়ছেই। তখনকার মতো বাইতুল মাকদিসের ওপর এখন কোনো ক্রুসও রাখা হয়নি। এরপরও মুসলিমদের মাঝে দুর্বলতা ও হীনম্মন্যতার প্রকাশ। তারা বলছে, ইসরাঈল বাস্তবিকই একটি রাষ্ট্র, এর উৎখাতের ন্যূনতম আশা করা যায় না। সুতরাং ইসরাঈলের সাথে শান্তি ও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের বিকল্প নেই।

যে যুগে ক্রুসেডাররা বাইতুল মাকদিস শাসন করেছে, সে যুগেও মুসলিমরা দুর্বলতা ও হীনম্মন্যতায় ভেঙে পড়েনি। কেননা তারা আল্লাহর আদেশের অনুসরণ করত। আল্লাহ আদেশ করেন,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"তোমরা ভেঙে পড়ো না এবং দুঃখ পেয়ো না। তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।"[১২]

তারা ভেঙে পড়েনি। তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়নি।

আপনারা ইতিহাস পড়ুন। ইতিহাস খুঁজে দেখুন। ইবনু কাসীরের 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' পড়ে দেখুন।

৫৮৩ হিজরির সেই ঘটনাটি পড়ুন—যখন একানব্বই বছর পর কিভাবে মুসলিমরা বাইতুল মাকদিসে প্রবেশ করে জুমুআর সালাত পড়েছিল! এই ঘটনা আপনার মাঝে আশার সঞ্চার করবে যে, আজকের এ অবস্থাও বদলে যাবে ইন-শা-আল্লাহ।

---

[১২] সূরা আলে ইমরান : ১৩৯

যদি আপনি কোনো ধরনের শিক্ষা গ্রহণ ব্যতিরেকে ইতিহাস পড়েন এবং ইতিহাসের কোনো একটি সময়ের মাঝে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখেন, তাহলে আপনার মাঝে হতাশা ও নৈরাশ্য সৃষ্টি হবে।

আমাদের অবশ্যই ইতিহাস থেকে গ্রহণ করতে হবে যেন আমাদের মাঝে ঈমানি শক্তি, উদ্যোমতা ও স্পৃহা সৃষ্টি হয়।

ষষ্ঠ কারণ : আপন শক্তি কাজে না লাগানো

এই দ্বীনকে আঁকড়ে ধরার মধ্যে যে কী অপরিমেয় শক্তি নিহিত, তা আমরা এখনো জানি না। পরিণামে আমরা দ্বীন ছেড়ে দিয়েছি, দ্বীনের অন্তর্নিহিত শক্তির খোঁজ আমরা করি না। জীবনের বিস্তৃত রূপরেখা দাঁড় করানোর জন্য ইবাদত, বিধি-বিধান ও যা কিছু প্রয়োজন, সবই দ্বীনের মধ্যে রয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের কী কী করতে হবে, সবই সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে দেয় এ দ্বীন।

বাস্তবিক অর্থে এ অনেক বড় ত্রুটি এই যে, আমাদের কাছে আদর্শ, শক্তি, পৃথিবীর ধনভান্ডার—সবই আছে; কিন্তু আমরা এগুলো থেকে উপকৃত হতে পারি না। কবি বলেন,

পূর্ণতা দেওয়ার ক্ষমতা আছে, তবু অপূর্ণতা!
মানুষের এর চেয়ে বড় ত্রুটি হতে পারে না।

অর্থাৎ সবচেয়ে বড় ত্রুটি হলো আপনি কোনো কাজ করতে সক্ষম, তারপরও সে কাজ করছেন না।

সপ্তম কারণ : সর্বোচ্চ স্বপ্ন দেখতে ভয় পাওয়া

অনেক সময় মুসলিমদের প্রত্যাশা থাকে সামান্য এবং খুবই সীমিত। মুসলিমদের মাধ্যমে অন্যরা স্বপ্ন দেখে কিংবা মুসলিমরা অন্যের স্বপ্ন পূরণের মাধ্যম হয় মাত্র। মুসলিমদের আকাঙ্ক্ষা হয় খুব সীমিত, তারা বড় আকাঙ্ক্ষা লালনের চিন্তাও করে না; মুসলিমরা পাহাড়ের চূড়া দেখে ভয় পেয়ে পাহাড়ের তলদেশে কিংবায় উপত্যকায় বাস করে। কবি বলেন,

পাহাড়ে আরোহণের ভয়ে
গর্তের মধ্যে আবাস গড়েছে যুগের পর যুগ...

আলী ইবনে আবি তালিব সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি তার সন্তানকে জিজ্ঞেস করলেন, কার মতো হতে চাও? সন্তান বলল, আপনার মতো। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, না, তুমি বরং রাসূলের মতো হতে চাইবে। কেননা তোমার

লক্ষ্য যদি হয় আলীর মতো হওয়া, তাহলে আর আলীর সমান তুমি হতে পারবে না, কিন্তু তোমার লক্ষ্য যদি হয় রাসূলের মতো হওয়া আর তোমার আদর্শ যদি হন রাসূল, তাহলেও তুমি তোমার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না, তবে শ্রেষ্ঠত্বে হয়তো তুমি আলীকেও ছাড়িয়ে যেতে পারবে।

মানুষের লক্ষ্য যত বড় হয়, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার প্রস্তুতি ও উপকরণও সে সেভাবেই গ্রহণ করে।

অষ্টম কারণ : পরাজিত জাতির ন্যায় বেঁচে থাকা

পরাজিত জাতির ন্যায় মুসলিমদের বেঁচে থাকা। মানুষ যখন পরাজয় ও হীনম্মন্যতায় ভোগে, তখন সে অন্যের অন্ধ-অনুকরণ করে এবং অন্যের কাছে ভালো-মন্দ যা পায় বাচ-বিচার ছাড়াই গ্রহণ করে।

ইবনে খালদুন তার 'মুকাদ্দামায়' এ ধরনের মানসিকতার সমালোচনা করে বলেন,

পরাজিতরা সর্বদা বেশভূষা, বিশ্বাস ও সর্বক্ষেত্রে বিজয়ীদের অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত থাকে। মানুষের বিশ্বাস হলো, যে তাকে পরাজিত করেছে তার মাঝে নিশ্চয় পূর্ণতার গুণ রয়েছে। বিজিতরা বিজয়ীদের অন্ধ অনুকরণ করে দুইটি ধারনা থেকে। হয়ত এ জন্য যে, তার মাঝে পূর্ণতার বৈশিষ্ট্য আছে কিংবা এ জন্য যে, সে বিশ্বাস করে, সাধারণ ক্ষমতা বলে সে তাকে পরাজিত করেনি; বরং তার মধ্যে বিজয়ীর গুণ আছে বিধায় সে এই সফলতা অর্জন করেছে।

পরাজিত মানসিকতার এই বৈশিষ্ট্যটি আমাদের মাঝে পূর্ণরূপে দেখতে পাবেন, সবকিছুতেই বিজাতীয় লোকদের অনুকরণ...।

খ) বহিরাগত কারণসমূহ

মানসিক বিপর্যয়ের পিছনে বহিরাগত যে কারণগুলো মুসলিমদের প্রভাবিত করেছে, সেগুলো নিচে তুলে ধরা হলো।

প্রথম কারণ : শত্রুদের ক্ষমতাকে বড় করে দেখা

শত্রুদের ক্ষমতাকে বড় করে দেখা এবং তাদের ক্ষমতাকে অতিরঞ্জন করে তুলে ধরা।

যেমন কিছু মানুষ বলে, রাশিয়া ও আমেরিকার অনেক শক্তি। মূলত নিজেদের ইয়াকীন ও আস্থা দুর্বল হওয়ায় পরাশক্তির শক্তির সামনে এরা নিজেদেরকে হেয় করে দেখছে। আল্লাহ বলেন,

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

"তার সৈন্যের কথা তিনি ছাড়া কেউ জানে না।"[১৩]

যদি মুসলিমরা আল্লাহর সৈন্য-সামান্তের প্রতি লক্ষ করত তাহলে তারা অনুধাবন করতে পারত যে, একটা মাত্র ভূমিকম্প আমেরিকার মেক্সিকো ও সানফ্রান্সিস্কোর মতো শহরকে মূহূর্তে ধসিয়ে দিতে পারে এবং তাদের তৈরি পারমাণবিক ক্ষমতা উল্টো তাদের বিরুদ্ধেই যেতে পারে। 'চেরনোবিল' দুর্ঘটনার কথা ভাবুন। এ দুর্ঘটনায় বিরাটসংখ্যক মানুষ মারা গিয়েছে; তারা এতটাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়েছে যে, এখন এ পারমাণবিক ক্ষমতা রোধ করার চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছে।

যে মুসলিমের আস্থা ও ইয়াকীন আছে সে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার সৈন্য-সামান্তের কথা জানে এবং উপকরণ গ্রহণে সচেষ্ট থাকে।

দ্বিতীয় কারণ : মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে ধৈর্য না ধরা

পশ্চিমারা তাদের পেশিশক্তি প্রদর্শনের জন্য মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধকে কাজে লাগাচ্ছে।[১৪] একমাত্র ঈমান, ধৈর্য আর তাকওয়ার মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রতিহত করা সম্ভব। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

"আর যদি তোমরা সবর করো ও তাকওয়া অবলম্বন করো, তাহলে তাদের কোনো চক্রান্তই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।"[১৫]

তৃতীয় কারণ : সবকিছু পশ্চিমা লেন্সে দেখতে পছন্দ করা

পঞ্চম বাহিনী বলতে আরবীতে একটা প্রবাদ আছে। মুসলিমদের মধ্যে একটা পঞ্চম বাহিনী আছে। তারা মুসলিম তথা আমাদেরই সন্তান, আমাদেরই চামড়ার এবং আমাদেরই ভাষার। তারা শত্রুর কোলে (শত্রুর দেশে) লালিত পালিত হয়ে দেশে ফেরে। এসে তারা এমন সব দাবি উপস্থিত করে, যা তাদের মানসিক পরাজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে। মূলত তারা (আত্মবিসর্জন দিয়ে) তাদের গায়ে পশ্চিমা ব্যক্তিত্বকে জড়িয়েছে।

চতুর্থ কারণ : প্রবৃত্তির মাঝে ডুবে থাকা

এখন শত্রুরাও জানে, মুসলিমদের দুর্বলতা কোথায়? তারা সে দিক থেকেই আক্রমণ

---

[১৩] সূরা মুদ্দাসসির : ৩১

[১৪] এটি উনবিংশ শতাব্দীতে লেখা, যখন পশ্চিমা আর সোভিয়েত ইউনিয়নের মাঝে শীতল যুদ্ধ চলছিল।

[১৫] সূরা আলে ইমরান : ১২০

করছে। এটি হলো প্রবৃত্তির দিক থেকে দুর্বলতা। উদাহরণস্বরূপ ফ্রান্সের রাজা নবম লুইস আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসে গ্রেফতার হলে তাকে মিসরের মানসুরায় একটি জেলখানায় বন্দি রাখা হয়। সে চার বছর এখানে বন্দি ছিল। এই সময়টাতে সে মুসলিমদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে। এরপর যখন সে ছাড়া পেয়ে তার দেশে ফিরে যায় তখন বলেছিল, সৈন্য-সামন্ত বাড়িয়ে কিংবা সামরিক শক্তি দিয়ে তোমরা মুসলিমদের পরাজিত করতে পারবে না। তাদের পরাজিত করতে হলে নারী এবং মদের বোতল দরকার। ফলে এখন তারা জানে কিভাবে কী করতে হবে। যেহেতু তারা বিশ্ব শাসন করতে চাইছে, তাই এই বিষয়েও জেনে নিয়েছে যে, কিভাবে বিশ্বকে শাসন করতে হয়। মূলত তারা প্রবৃত্তির দিক থেকে মানুষকে দুর্বল করে শাসন করছে। উদাহরণস্বরূপ ফ্রিম্যাসনদের (ইহুদি সংঘ) কথা বলা যায়। তাদের একটি নিকৃষ্ট পদ্ধতি আছে। তারা 'রোটারি' ও 'লিউনিজ'এর মতো কিছু ক্লাব তৈরি করেছে। এসব ক্লাবে তাদের আয়োজনে তরুণ যুবসমাজ নয়, বরং আমন্ত্রিত হয়ে বড় বড় ব্যক্তিবর্গ আসে। এসব বড় বড় ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে তারা শাসক-বিচারক ও আমীর-উমারার কাছ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

যারা এসব ক্লাবে আমন্ত্রিত হয়ে আসে, ওদেরকে মদ ও নারী পরিবেশন করা হয় এবং (সুযোগমতো) তাদের বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করে রাখা হয়। যেমন বিশেষ মুহূর্তের কোনো ছবি। ধরুন, সে বিবস্ত্র অবস্থায় কিংবা একাকী কোনো নারীর সাথে আছে। এটা গোপন ক্যামেরায় রেকর্ড করা হয়। তারপর সেই ছবি বা ভিডিওর মাধ্যমে সেই ব্যক্তিকে ব্ল্যাকমেইল করা হয়। এভাবে তারা গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে ব্ল্যাকমেইল করে তাদের সাথে দরাদরি শুরু করে। বলে, এই রেকর্ডের বিনিময়ে কী দিবেন? আমরা চাই, ওমুককে আপনার ওখানে নিয়োগ দিন, অমুক আপনার অফিসের পরিচালক হোক, এটা এমন... ওটা ওমন... সেই উচ্চপদস্থ ব্যক্তি তখন 'না' বলতে পারে না এই ভয়ে যে, অন্যথা হলে তাকে মানুষের কাছে অপদস্থ হতে হবে।

একইভাবে এরা মুসলিম সমাজের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদেরকে তাদের সম্পদ আত্মসাৎ-এর সুযোগ নিয়ে কিংবা ঘুষ দেওয়ার মাধ্যমেও জিম্মি করে নেয়। মুসলিম শাসক ও আমির উমারাদের প্রবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে আরো বিভিন্ন পন্থায় তাদের নিয়ন্ত্রণ করে।

শাসক ও বড় বড় ব্যক্তিবর্গ যদি নারী ও মদের কাছে ধরাশায়ী না হতো এবং যদি তারা ঘুষ ও তথাকথিত উপঢৌকন গ্রহণ না করত, তাহলে তারা হতো ফ্রেশ ও স্বাধীন ব্যক্তিত্ব এবং ওরা তাদের প্রভাবিত করতে পারত না।

মূলত এটাই মুসলিমদের দুর্বল জায়গা। এই পথ ধরেই তারা আমাদের ওপর হামলে পড়েছে।

প্রতিকার

মানসিক বিপর্যয়ের ব্যাধিতে আক্রান্ত উম্মাহর প্রতিকার কী হবে?

প্রথম উপায় : সমস্যার কারণ উদঘাটন করা

প্রথমেই আমাদের সমস্যার কারণ উদ্‌ঘাটন করতে হবে। আমাদের অনুধাবন করতে হবে যে, সত্যই আমাদের মানসিক বিপর্যয় ঘটেছে। এটি দ্বীন থেকে দূরত্ব সৃষ্টির কারণেই ঘটেছে। সেজন্যই আমাদের আজকে এই দশা! সমস্যা নির্ণয় করতে পারলেই সমাধানের অর্ধেক পথ পরিষ্কার হয়ে যায়।

দ্বিতীয় উপায় : দৃঢ় ঈমানের ওপর নিজেকে গঠন করা

দ্বিতীয় হলো ঈমানের ওপর নিজেকে গঠন করা। সহস্র মাইল পথের সূচনা হয় একটি ধাপ দিয়ে। সেই প্রথম ধাপটি হলো—যুবক-বৃদ্ধ, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকলকেই দ্বীনের সাথে লেগে থাকতে হবে এবং সঠিকভাবে দ্বীনের ওপর অবিচল থাকতে হবে। প্রকৃত দ্বীনের ওপর এমনভাবে গড়ে উঠতে হবে যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেই আমরা ভয় করব না।

এই বিশুদ্ধ আকীদা মস্তিষ্কের ভিতর চিন্তার আকারে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না, বরং কর্মের মাধ্যমে একে বাস্তবায়ন করতে হবে। অবাক করার বিষয় হলো কিছু কিছু মানুষ আছে—তারা বলে, তোমরা আকীদা অধ্যায়ন করে কী করবে? কেন তোমরা কমিউনিজম নিয়ে কথা বলো না? সাম্যবাদ নিয়ে আলোচনা তোলো না?

আমি বলি, আকীদা আপনাকে শক্তি জোগাবে এবং আত্মমর্যাদাবোধ দান করবে। আমি আপনাকে এ বিষয়টি কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি—

জাহেলি যুগে মানুষ যখন কোনো উপত্যকায় অবতরণ করত, তারা সে এলাকার সরদারের নামে সেখানকার জিনদের থেকে পানাহ চাইত, কারণ তারা জিন ভয় পেত। তারা জিনদেরকে নির্বোধ বলত। (অথচ দেখুন, ইসলামি আকীদার ফলে) আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে আশ্রয় খুঁজি না, আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে আশ্রয় গ্রহণ করি না। এটা এজন্যই যে, জিন বিষয়ে আমরা আমাদের আকীদা জানি; আমরা

জানি, জিনদের মধ্যেও ভালো খারাপ আছে। যেমন সূরা জিনে এক জিনের বক্তব্য এভাবে এসেছে—

وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا

"আমাদের মাঝেও সৎ আছে, আছে এর ব্যতিক্রম; আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে বিভক্ত।"[১৬]

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَٰسِطُونَ

"আমাদের মধ্যেও আছে কিছু মুসলিম আর কিছু অবিচারকারী।"[১৭]

জিনদের মাঝেও অনেক দাঈ আছে আর তারা আল্লাহর সৃষ্ট; কারো উপকার-অপকারের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা তাদের নেই।

আকীদার এই জ্ঞান আমাদের শক্তি জোগায় এবং বিশ্বাসের দৃঢ়তা দান করে। ফলে আমাদের চেতনা আছে, কিভাবে এই বিশ্বে চলাফেরা করতে হবে। অতএব এই আকীদা আমাদের কার্যত এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব দান করে।

আরেকটি উদাহরণ—কুলক্ষণে বিশ্বাসের প্রসঙ্গ। বুখারি বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, (পাখি উড়িয়ে বা উড়ন্ত পাখি দেখে) কুলক্ষণে বিশ্বাস তথা 'কুফা' ও অপয়া বলতে কিছু নেই; উত্তম আশা-আকাঙ্ক্ষা আমার পছন্দ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, রোগ সংক্রমণের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই, পাখির কোনো ক্ষমতা নেই।

জাহেলি যুগে লোকেরা সফরে বেরিয়ে যদি কোনো কালো পাখি দেখত, তাহলে তারা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে যাত্রাবিরতি করত। কেননা তারা ভয় পেত, কোনো অঘটন ঘটবে কি না। কোনো সন্দেহ নেই যে, অহেতুক ভীতি একধরনের মানসিক পরাজয়।

মানুষ যখন সঠিক আকীদা ও বিশ্বাসের জ্ঞান লাভ করবে এবং জানবে যে, পাখী বা অন্য কোনো বস্তু দেখে 'কুলক্ষণে' ভেবে ভয় পাওয়ার বিশ্বাস ভিত্তিহীন আর জাহেলি যুগের মানুষের কর্মবিশেষ, তখন যাই ঘটুক—সে কি এ ধরনের অমূলক বিশ্বাস লালন করতে পারে? সুতরাং মুসলিম যখন এ বিশ্বাস অর্জন করবে, সে হবে কার্যত শক্তিশালী এবং এ শক্তির একটি কার্যকরী ভূমিকা তার জীবনে প্রতিফলিত হবে।

---

[১৬] সূরা জিন : ১১

[১৭] সূরা জিন : ১৪

এখনো আপনি অনেক মুসলিম দেখতে পাবেন, যারা বর্তমানেও এ ধরনের অনেক কুসংস্কার লালন করে। যেমন ঘোড়ার খুর ঘরের চৌকাঠে ঝুলিয়ে রাখে, কেউ ছোট বাচ্চার স্যান্ডেল (আরবে) গাড়িতে ঝুলিয়ে রাখে যেন বদনজর না লাগে। প্রকৃত কথা হলো এরা বদনজর, হিংসা ও জিনকে ভয় পায় এবং এ ভীতি নিয়ে তারা বেঁচে আছে।

পক্ষান্তরে যে মুসলিম প্রকৃত অর্থেই সঠিক আকীদার প্রতি বিশ্বাস রাখে সে নিশ্চিন্তমনে বসবাস করে আর সে জানে, কিভাবে সমাজ, জীবন ও মানুষের সাথে আচার-আচরণ করতে হয়। সে জানে, ভীতি একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং রিযিকও এক আল্লাহর হাতে; ফলে সে কোনো হারামের প্রতি নমনীয় হতে পারে না। এক আলজেরিয়ান ভাইয়ের সাথে লন্ডনে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তার ঘটনা আপনাদের বলছি। তিনি বলেন—আমি একটি আবাসিক হোটেলে কাজ করার জন্য গিয়েছিলাম। হোটেলের মালিক ব্যক্তিগত সাক্ষাতের পর আমাকে বললেন, চলো আগে পার্টির আয়োজন করি এবং বারে গিয়ে কিছুটা ড্রিংকস করি। তারপর তোমার বিষয়টা আমরা ভেবে দেখব। তখন সেই যুবকটি খুব দ্বিধায় পড়ে গেল। সে ভাবল, আমি তো মদ খাই না, তবুও আমার জীবিকা যেন বন্ধ না হয় সেজন্য কি আমি এই লোকটিকে সন্তুষ্ট রাখব? অবশেষে সে সিদ্ধান্ত নিল লোকটিকে বলবে, আমি মদ পান করি না। যদি সে গ্রহণ না করে, করবে না।

সে তাকে বলল, আমি মুসলিম, মদ পান করি না। মালিক বললেন, সত্যি? সে জানাল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে চাকুরির জন্য এখন থেকেই তুমি গৃহীত। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কারণ কী? তিনি বললেন, এখানে যারা আছে, সবাই মদ খেয়ে অনেক রাত পর্যন্ত জাগে। সকালে দেরি করে আসে। তাই সবার আগে তোমাকেই নেওয়া হলো।

মানুষ যখন প্রকৃত অর্থেই জানবে রিযিক আল্লাহর হাতে, আল্লাহ তখন তার জন্য রিযিকের দরজাগুলো খুলে দিবেন। এই ব্যক্তি তো ধারণাই করেনি যে, 'আমি মুসলিম, মদ পান করি না'—এটা বলার পর তাকে নিয়োগ দেওয়া হবে।

মুমিন ব্যক্তি যখন তার দ্বীন প্রকৃত অর্থেই পালন করে তখন সে সমস্ত শক্তির চাবিকাঠি পেয়ে যায়। সে তো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করছে, তাই আশা করা যায়, পার্থিব জীবনেই তার জীবিকার সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

তৃতীয় উপায় : দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া

আমরা এই পার্থিব জীবনের সাথে সম্পর্ক গড়ার থেকে দূরত্ব বজায় রাখব এবং আখেরাতের সাথে নিজেদেরকে আবদ্ধ করব। এটা আমাদের শক্তিশালী ও মর্যাদার

অধিকারী বানিয়ে দেবে। আমরা সে-সমস্ত ক্ষেত্র ও অবস্থান অন্বেষণ থেকে দূরে থাকব, যা নিছক পার্থিব জীবনের সাথেই সম্পৃক্ত এবং যা আমাদের দ্বীনকে করবে ক্ষতিগ্রস্ত।

এমন কিছু মানুষকে পাবেন, যারা দস্তরখান আর দাওয়াতের খোঁজে থাকে। তাদের হৃদয় যেন সর্বদা খাবারের সাথে লেগে থাকে। (দুনিয়ার মোহে) এদের ব্যক্তিত্ব দুর্বল ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

দেখবেন, যে আলেমের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব রয়েছে, তাকে কেউ কিছু উপহার দিলে সে গ্রহণ করে না, বরং বলে—আমাকে মাফ করুন, আমি হাদিয়া গ্রহণ করি না। ফলে সে মানুষের চোখে বড় হয় এবং তার অনেক প্রভাব থাকে। যখন আমরা এই পার্থিব জীবনের সাথে সম্পর্ক না করে দূরত্ব বজায় রাখব, তখনই আমরা মানসিকভাবে ও গুণগতভাবে শক্তিশালী হতে পারব।

আমাদের ইতিহাসের পাতায় পাতায় এ ধরনের বাস্তব ঘটনা ছড়িয়ে আছে—শাসকগণ এমন আলেমদেরকে মূল্যায়ন করতেন, যারা পার্থিব জীবনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলতেন। কোনো কোনো শাসকের বেলায় তো এমনো হয়েছে, তারা একজন আলেমকে দাওয়াত করে বলছেন, আপনি আমাদের কাছে কেন আসেন না? তখন আলেম শাসককে বললেন, 'আপনি আমার জানের নিরাপত্তা দিবেন, কেবল এই শর্তেই আমি আপনকার কাছে একটা বিষয় চাইব। শাসক বললেন, আপনাকে এই অধিকার দেওয়া হলো। তখন আলেম বললেন, যদি আমি নিজ থেকে আপনার কাছে না আসি, তবে আপনি আর আমাকে ডাকবেন না। আর আপনার কাছে কিছু চাওয়ার আগে কখনো আপনি আমাকে হাদিয়ে পাঠাবেন না।

এভাবে একজন আলেম শাসককে বেকায়দায় ফেলে দিতেন। তিনি শাসকের কথা শুনতেন না। আর শাসকেরও জানা আছে, তিনি আলেমকে তার প্রতি আকৃষ্ট করতে পারবেন না। তো এভাবেই দুনিয়া থেকে দূরত্ব বজায় রাখার গুণ আমাদের স্বয়ংসম্পন্ন এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব দান করে।

চতুর্থ উপায় : ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া

ভালোভাবে ইতিহাসে প্রত্যাবর্তন করা। এর জন্য আমাদের উচিত বেশি বেশি মনীষীদের জীবনী পাঠ করা। এটি সান্ত্বনা গ্রহণের জন্য নয়; বরং তাদের জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য।

ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে আপনারা আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া পড়ে দেখুন। রাসূলের সীরাত, পরবর্তীদের জীবনী, মুসলিমদের ইতিহাসে আরো যা যা

ঘটেছে সেসব ইতিহাস আপনাদের মুসলিমদের সম্পর্কে একটি বাস্তব চিত্র দেবে—যা আপনাদের স্বপ্ন দেখতে উদ্‌বুদ্ধ করবে।

মুসলিমরা এখন ভুলের যে গ্লানি বয়ে চলেছে, আপনাদের মস্তিষ্ক যেন এর মাঝে সীমাবদ্ধ না থাকে। অন্যথায় আপনাদের মাঝে হতাশা সৃষ্টি হবে; আপনি হয়তো বলবেন, দাঈদেরই যখন এ করুণ অবস্থা! তাহলে সমস্ত মানুষ ছেড়ে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকা উচিত।

এটা ভুল। আপনাকে ভালোভাবে ইতিহাস পড়তে হবে। আপনাকে জানতে হবে, আমাদের শক্তির উৎস কী এবং আমাদের ফিরে আসার পথ কোনটি? তারপর ফিরে আসতে হবে দ্বীনের পথে।

পঞ্চম উপায় : আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা

হে যুবসমাজ! অবশ্যই আমাদের উচ্চ হিম্মত লালন করতে হবে, আমাদের নিজেদেরকে গড়তে হবে—যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবীগণকে গড়ে তুলতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জীবিকা উপার্জনের জন্য পরিশ্রম করা শিখাতেন এবং তাদেরকে মানুষের কাছে সাহায্য না চাওয়ার শিক্ষা দিতেন। সুতরাং বস্তুগত ও গুণগত উভয় দিক থেকেই সবাইকে স্বয়ংসম্পন্ন হওয়া উচিত, যেন শত্রুরা আমাদের কাছে আসার কোনো পথ খুঁজে না পায়। আমাদের দুর্বল হলে চলবে না, অথচ এই বৃটেনে এমনো কিছু মুসলিম আছে, যাদের অধিকাংশ জীবনোপকরণ আসে বৃটিশ সরকারের অনুদান থেকে।

অবশ্যই যার যে সামর্থ্য আছে তা কাজে লাগাতে হবে। যারা পারে অর্থনীতিনির্ভর প্রতিষ্ঠান করবে। কাফেরদের মোকাবিলা করার জন্য এসবের মধ্য দিয়ে মুসলিমদের শক্তি-সামর্থ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবসাদগ্রস্ততা ও অলসতার নিন্দা করেছেন; বিপরীতে তিনি দুআ শিখিয়েছেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে (এসব বিষয়ে) আশ্রয় চাই— দুর্দশা ও দুশ্চিন্তা, অক্ষমতা ও অলসতা, ভীরুতা ও কৃপণতা, ঋণের বোঝা, এবং লোকজনের কাছে পরাজয় বরণ থেকে।'

সুতরাং আমাদের উচিত সকাল-সন্ধ্যা অক্ষমতা ও অলসতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

মুসলিমের আরেকটি হাদীস—এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير

"শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিন থেকে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় ও উত্তম, তবে উভয় মুমিনের মাঝে কল্যাণ আছে।"

আরেকটি হাদীস :

أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان أصابك شئ فلا تقل لو أنى فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل

"যা কিছু তোমার উপকারে আসে সেসবে নিবিষ্ট হও, তুমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও, হাল ছেড়ে দিয়ো না। যদি অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু তোমাকে স্পর্শ করে তবে এ কথা বোলো না যে, যদি এমন এমন করতাম, তাহলে ওমন ওমন হতো। তুমি বরং বোলো—এটাই আল্লাহর ফয়সালা! তিনি যা চেয়েছেন তা-ই করেছেন।"

অতীতের ঘটে যাওয়া বিষয় নিয়ে আত্মতিরস্কার আর আফসোস করে করে তুমি ভবিষ্যৎ কাটিয়ে দিয়ো না। তুমি কখনো বোলো না, আহ! যদি এমন করতাম... এমন করতাম...এমন করতাম!

একজন মুসলিমকে অবশ্যই শক্ত মানসিকতা রাখতে হবে। মুসলিম ভুল করলে কিংবা বিপদের সম্মুখীন হলে বলবে—আল্লাহর ফয়সালা! আল্লাহ যা চান তা-ই করেন! সে নতুন করে শুরু করবে এবং ভবিষ্যতের জন্য কাজ করবে।

সাইকিয়াট্রিকদের একটি সাধারণ মন্তব্য হলো—আত্মতিরস্কার বিষণ্ণতার জন্ম দেয়। যখন তুমি নিজেকে বারবার দোষারোপ করবে, তখন তোমার 'বিষণ্ণতা'ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা বেড়ে যাবে। এ ধরনের তিরস্কার থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উৎসাহিত করেছেন বিপদের সময় আমরা যেন এ দুআটি পড়ি :

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

"আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কতই-না উত্তম ব্যবস্থাপক।"

কিংবা যেন আমরা বলি : قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ "এ হলো আল্লাহর ফায়সালা। তিনি

যা চান, তা-ই করেন।”

আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ অপারগতার জন্য নিন্দা করেন, তোমার দায়িত্ব বিচক্ষণ থাকা। যখন কোনো কিছু তোমাকে ভারাক্রান্ত করবে তখন বলবে :

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কতই-না উত্তম ব্যবস্থাপক।”

অর্থাৎ সর্বদা নিজেকে দোষারোপ না করে বলুন, ‘আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি কতই-না উত্তম ব্যবস্থাপক!’ বলতেই থাকুন এবং চেষ্টা অব্যাহত রাখুন, যতক্ষণ না আপনার মানসিক শক্তি অর্জিত হয়।

হাদীসে ‘কায়স’ বা বিচক্ষণতা বলতে বোঝানো হয়েছে কর্মে বুদ্ধিমান, কুশকুশে, উদ্যমী, কোমল ও নিরাপদ থাকা। অর্থাৎ তোমাকে দ্রুত উঠতে হবে, ক্ষিপ্র ও উদ্যমী হতে হবে, যদি তোমার কোনো সমস্যা হয়, সম্মুখ হতে কোনো বাধা আসে কিংবা পিছন থেকে শত্রুতা, তবে বলো—আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি কতই-না উত্তম ব্যবস্থাপক।

ষষ্ঠ উপায় : আগামীর দিন এ দ্বীনের পক্ষে

আমাদের নিরাশা ও নৈরাশ্যবাদীদের থেকে দূরে থাকতে হবে এবং জানতে হবে যে, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা হলো—আগামীর দিন এ দ্বীনের পক্ষে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনেক হাদীসও আছে যেখান থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

অধিকন্তু মুসলিমদের যে অধঃপতন দেখা যাচ্ছে, এখান থেকেও পরিত্রাণ হবে। আল্লাহ বলেন,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদের ওয়াদা দিয়েছেন যে :

- তিনি অবশ্যই তাদের পৃথিবীতে খিলাফাত দান করবেন যেমন ওই সমস্ত লোকদের দিয়েছেন যারা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

◆ তিনি তাদের পূর্ণরূপে দ্বীন মেনে চলার সামর্থ্য দান করবেন, যে দ্বীনকে তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন।

◆ তিনি তাদের ভীতিকে নিরাপত্তায় বদলে দিবেন;

(সুতরাং) তারা যেন আমার ইবাদত করে, আমার সাথে যেন আর কাউকে শরীক না করে।[১৮]

এই বিষয়গুলো পাওয়ার জন্য দুইটি শর্ত প্রযোজ্য :

১. এক আল্লাহর ইবাদত করতে হবে, ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ অর্থে ইবাদত বলতে যা বোঝায় সেভাবেই;

২. আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করা যাবে না অর্থাৎ শিরক থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থেকে ইবাদত করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقاتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودى من وراء الحجر، فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودى خلفى فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود.

"এই ঘটনা ঘটার আগে কিয়ামত সংঘটিত হবে না—মুসলিমরা ইহুদিদের সাথে লড়াই করবে, অবশেষে (জান বাঁচাতে) ইহুদিরা পাথর কিংবা গাছের আড়ালে লুকাবে, তখন সেই গাছ কিংবা পাথর ডেকে ডেকে বলবে, হে আল্লাহর বান্দা! এই যে আমার পিছনে একজন ইহুদি! এসো, তাকে হত্যা করো। তবে 'গারকাদ' গাছ বলবে না, কেননা তা ইহুদিদের পক্ষের গাছ হবে।"[১৯]

সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত মুসলিম শরীফের হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"আল্লাহ পৃথিবীকে গুটিয়ে সংকুচিত করে দিয়েছেন, ফলে আমি পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম দেখেছি। পৃথিবীর যতটুকু আমার সামনে গুটিয়ে তুলে ধরা হয়েছে সর্বত্র আমার উম্মাতের রাজত্ব পৌঁছে যাবে।"[২০]

হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী রাসূলের সামনে যতটুকু গুটিয়ে দেওয়া হয়েছে সে পর্যন্ত

---

[১৮] সূরা নূর : ৫৫

[১৯] মুসলিম : ২/৩৯৬

[২০] মুসলিম : ২/৩৯০

তার উম্মাতের রাজত্ব পৌঁছে যবে। আর রাসূলের সামনে তো পূর্ব থেকে পশ্চিম মেরু সম্পূর্ণ গুটিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। এ ভবিষ্যদ্বাণী এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। তার মানে ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

দিনের আলো ও রাতের আঁধার যেখানে যেখানে পৌঁছেছে, সেখানে সেখানে এই দিনও পৌঁছে যাবে, কাচা-পাঁকা সমস্ত ঘরেই আল্লাহ এ দ্বীন প্রবেশ করাবেন, প্রকৃত সম্মানীকে সম্মানিত করে এবং লাঞ্ছিতদের অপদস্থ করে। সে সম্মান হবে ইসলামের সম্মান আর সে অপদস্থতা হবে কুফরির অপদস্থতা।[২১]

আরেকটি হাদীস : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন শহর আগে জয় হবে? কনস্ট্যান্টিনোপল নাকি রোম? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, প্রথম জয় হবে হিরাক্লিয়াসের শহর অর্থাৎ কনস্ট্যান্টিনোপল।[২২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

যতদিন আল্লাহ চান তোমাদের মাঝে নবী থাকবেন; তারপর যখন আল্লাহ চান নবীকে উঠিয়ে নিবেন। এরপর আসবে নবুওয়াতের আদলে খিলাফাত। আল্লাহর যতদিন ইচ্ছা খিলাফাত থাকবে। আল্লাহ যখন চাইবেন খিলাফাত উঠিয়ে নেবেন। তারপর আসবে ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। যতদিন আল্লাহ চান ন্যায়পরায়ণতা থাকবে। তারপর আল্লাহর যখন ইচ্ছা হবে তিনি এ শাসন উঠিয়ে নিবেন। তারপর আসবে স্বৈরশাসক বাদশাহ, যতদিন আল্লাহ চান তা থাকবে। এরপর যখন ইচ্ছা করবেন তিনি এ শাসন উঠিয়ে নিবেন। তারপর আবার নবুওয়াতের আদলে খিলাফাত আসবে। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ থাকেন।[২৩]

আমাদের আলোচ্য বিষয় হাদীসের এতটুকু—তারপর আবার নবুওয়াতের আদলে খিলাফাত আসবে। আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

"তিনিই তাঁর রাসূল প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে, যেন তিনি এ দ্বীনকে সমস্ত ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।[২৪]

---

[২১] আহমাদ, মুসনাদ : ৪/১০৩

[২২] আহমাদ, মুসনাদ : ২/১৭৭

[২৩] আহমাদ, মুসনাদ : ৪/২৭৩

[২৪] সূরা তাওবা : ৩৩

কিছু মানুষ মনে করে, উপরিউক্ত আয়াতটির আবেদন পূর্ণ ও সমাপ্ত হয়ে গেছে, এটার আর পুনরাবৃত্তি হবে না। এটা ভুল, কেননা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আবারো লাত-উজ্জার পূজা করা অবধি দিন-রাতের বিবর্তন বাকি থাকবে।[২৫] তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো ভাবতাম এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর দ্বীন পূর্ণ হয়ে গেছে—

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

"তিনিই তাঁর রাসূল প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে, যেন তিনি এ দ্বীনকে সমস্ত ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।[২৬]

জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহর ইচ্ছা হলে অচিরেই তা হবে।[২৭]

এ-সমস্ত হাদীস প্রমাণ করে যে, আগামীর দিনগুলো এ দ্বীনের পক্ষে।

আলোচনার সময় সংক্ষিপ্ত। তা না হলে এ বিষয়েও আমি আলোচনা করতাম যে, আগামীতে জোরালো একটি উত্থান হবে। সেই উত্থানের মধ্যমে আগামীর দিনগুলো এ দ্বীনের পক্ষে হবে।

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহ যেন আমাকে ও আপনাকে নিরাশা ও নৈরাশ্যবাদীদের থেকে দূরে রাখেন এবং তিনি যেন আমাদের শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী করেন—যে ব্যক্তিত্ব এগোতে জানে, পিছু হটতে জানে না।

হে আল্লাহ! তুমি মহান, সমস্ত প্রশংসা তোমার। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি এবং তাওবা করে তোমারই কাছে ফিরে আসছি।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবীদের ওপর।

---

[২৫] অর্থাৎ, মানুষ জাহেলি জামানার মতো লাত-উজ্জার পূজা শুরু করার আগ পর্যন্ত কিয়ামত সংগঠিত হবে না।

[২৬] সূরা তাওবা : ৩৩

[২৭] আহমাদ, মুসনাদ : ৫/২৭৮

আব্দুল্লাহ আল খাতির। পুরো নাম আবু মুবারক আব্দুল্লাহ আল খাতির। জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫৫ সালে, জাজিরাতুল আরবের দাম্মাম শহরে। কলেজ পর্যন্ত দাম্মামেই পড়াশোনা করেন। এরপর ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে রিয়াদের কিং সৌদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেডিসিনে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তারপর দাম্মামের কিং ফয়সাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিন অনুষদে শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি স্নাতকোত্তর পড়াশোনার জন্য ১৯৮৩ সালে ব্রিটেনে যান। ওখানে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা শেষ করে ১৯৮৭ সালে জর্ডান পাড়ি জমান। জর্ডানের মেডিকেল কাউন্সিল থেকে ফেলোশিপ ডিগ্রি অর্জন করেন।

চিকিৎসাবিদ্যার পাশাপাশি দ্বীন ইসলামের খেদমত করতে থাকেন ড. খাতির। দাওয়াহ ও লেখনীর মাধ্যমে ইসলাম প্রচারে ভূমিকা রাখেন তিনি। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই হলো, 'শয়তানের প্রবেশপথ', 'দাওয়াতি কাজে মনোবিজ্ঞান', 'মুসলিমদের বিপর্যয়', 'ব্রিটেনে নারী' ইত্যাদি।

১৯৮৯ সালে তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সম্মানিত করুন। আমীন।

খিলাফাতের পতনের পর মুসলিম উম্মাহ কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছে। স্তিমিত ভাব বিরাজ করছে সবখানে। মরচে ধরেছে আমাদের মন ও মগজে। কমে গেছে কলমের ধার, ভোঁতা হয়ে গেছে তলোয়ার। মুসলিম উম্মাহ যে বিজয়ী জাতি, এ কথা ভাবতেও যেন অনেকের গা শিউরে ওঠে। আল্লাহ যে আমাদের বিজয়ের জন্যে প্রস্তুত করছেন, এ কথা শুনলে ভ্রু কুঁচকায় অনেকেই। যারা দ্বীনের জন্যে জীবন বাজি লাগাতে চায়, নৈরাশ্যবাদীরা তাদের পেছন থেকে টেনে ধরে রাখে। এরা আসলে মন-মগজে পাশ্চাত্যের গোলাম হয়ে গেছে। গোলামির ভাইরাস মিশে আছে এদের রক্তকণিকায়। এসব নৈরাশ্যবাদীদের জাগানোর জন্যেই এই বই।